পরীক্ষায় নকল, নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা

পরিতোষ কর্মকার

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের একটি মাধ্যম হচ্ছে পরীক্ষা। ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষার মূল্যায়ন হয় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষার মাধ্যমে। বোর্ড সরাসরি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। তাই বলা যায় রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃটিশ আমলে এর নাম ছিল যথাক্রমে এন্ট্রাস এবং ম্যাট্রিকুলেশন। প্রথম পাবলিক পরীক্ষার এই স্তরে কিশোর ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই স্তরের মূল্যায়নই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। কর্মপন্থার আলোকে দেশ এবং জাতির ভালমন্দ নির্ভর করে।

পরীক্ষার নকল কিংবা চিটিং পদ্ধতি বেশ পুরাতন। অনেক উন্নত দেশেও এই পদ্ধতির অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য শাস্তির বিধান আছে। আমাদের দেশেও এটা আছে। তবে এবার পরীক্ষা নামের প্রহসন চলেছে, তাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট শংকিত হওয়ার কারণ আছে। এ কারণে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে সচিত্র প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে, যেন পরীক্ষা নয়, নকলের প্রতিযোগিতা গণহারে শুরু হয়েছে। অবশ্য সব কেন্দ্রেই যে নকলের মহোৎসব হচ্ছে এটা ঢালাওভাবে না বললেও এর ব্যাপ্তি দেখে এবারই প্রথম বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় "শাক দিয়ে মাছ" ঢাকার যে প্রবণতা সেটা করা সম্ভব হয়নি, সংবাদপত্রের কারণে। কারণ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ছাত্রছাত্রীদের কাছে এখন অধিকার হিসেবে দাবি আকারে চিহ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর মানসিকতায় যে অন্যায়, অযৌক্তিক, অনৈতিক, দুই নম্বরি ভর করেছে এর জন্য দায়ী কে? বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারলে বিহিত করা সম্ভব।

পরীক্ষায় এই চিঠির পদ্ধতি পূর্ব থেকে চালু থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরীক্ষাতেই নকলের একটি মহড়া শুরু হয়।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে নিজেদেরকে অধিক জনপ্রিয়তা তুল্য হিসেবে গড়ে তুলবার তাগিদে এসব নেতা এই জাতীয় পরীক্ষায় নকলের মত অপরাধকে আমল দেননি এবং ক্ষেত্রবিশেষে উৎসাহ দিয়েছেন। অর্থাৎ স্থানীয় অনেক নেতাই এই মৌসুমকে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাবে নিয়েছিলেন। এবং সত্য পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ অভিভাবক বিষয়টিকে নিজেদের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সুনজরে দেখেছেন। এছাড়াও আরও একটি কারণ হচ্ছে—সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল রক্ত দিয়ে গড়া। রক্তের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রী মৌলিক অধিকারে ৪নং ধাপ অর্থাৎ শিক্ষা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হয়েছে। এ জাতীয় বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের মানবিকতায় কাজ করেছে। ফলে এই উদারনৈতিক দৃষ্টিগুলোই ছাত্রছাত্রীদেরকে নকলের মতো অপরাধ করতে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

এখানে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কথা বলা হলো এ কারণে যে, সব রকম অবকাঠামো ধ্বংস হওয়ার কারণে এ জাতীয় অপরাধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে একমাত্র রাজনৈতিক নেতাই সমাদৃত ছিলেন। এছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানোর মধ্য দিয়ে এ জাতীয় প্রবণতা রোধ করা সম্ভব ছিল। এটা উচ্চ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হয়েছিল এটা বলা যায়।

আওয়ামী লীগের ৩.৫ বছর শাসনের পর ৭৫ পরবর্তী সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশ শাসন করে। অপরাধের মাধ্যমেই যেহেতু আসীন, সেহেতু পরীক্ষায় মূল্যবোধ পরিমাপ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। পূর্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অনেক কিছুই তারা পাহারাদার হিসেবে পালন করেছেন। শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা রোধ ইত্যাদির যাচাই বাছাই ছিল তাদের কাছে নেহাতই সময়ের অপচয় মাত্র। বিষয়টি শাসক শ্রেণীর কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সমাজে সংঘটিত অনেক অপরাধের ন্যায় নকল করাকে অনেক পরীক্ষার্থী বোনাস হিসেবে পেয়ে যায়। কিন্তু এই বোনাস যে এতদিনে গোদের উপর বিষফোঁড়া হবে তা কি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নীতিনির্ধারণীতে ছিল? এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ বিভিন্ন সময় যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে সেখানেই গলদ থেকে গেছে। পরীক্ষা সম্পর্কিত এ রকম অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি হচ্ছে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষার পাসের হার বৃদ্ধি করতে হবে। এবং শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ পরীক্ষার্থী পাস না করলে ধরে নেওয়া হবে যে, সেই স্কুলে লেখাপড়া হয় না। অতএব, এহেন অপরাধে স্কুলের এবং শিক্ষকদের বেতন, অনুদান বন্ধ করা হবে। তথাকথিত মান বৃদ্ধির জন্য এ জাতীয় সিদ্ধান্ত ছিল শিক্ষকদের মহান পেশার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষকবৃন্দ এ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপের বাসিন্দা নন। সে কারণে অনেক শিক্ষক স্কুলের এবং নিজের অনুদান টিকিয়ে রাখবার জন্য শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নকলে সহযোগিতা করাকে উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক প্রবীণ শিক্ষকও পূর্বের ভাবমূর্তি, খ্যাতি জলাঞ্জলি দিয়ে এ জাতীয় অনৈতিক কাজের সাথে আপোস করেছেন, শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্যে। যৎসামান্য বেতন কিংবা অনুদানের সাথে শিক্ষার মান কিভাবে সম্পর্কিত এ প্রশ্ন সচেতন মানুষ করতেই পারে। এ ধরনে ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির কারণে 'শিক্ষা জাতীয় মেরুদন্ড', শিক্ষক মানুষ গড়ার করিগর" এসব প্রহসনের বুলিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটই নকল নামক দুর্নীতিকে প্রকারান্তরে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

যত্রতত্র স্কুল গজিয়ে উঠা, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শিক্ষকের অভাব এবং এ কারণে প্রলোভনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি—এ ধরনের অন্যায় কাজের প্রতি সমর্থন সৃষ্টি করে। এখানে আর্থিক কিংবা অন্য কথায় সামাজিক গ্যারান্টির অভাব পেছনের ভূমিকায় থাকে। অভিভাবকবৃন্দও সামাজিক গ্যারান্টির অভাবের কারণে দ্রুত নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে, অর্থাৎ তাদের চরম সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের উপর সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে যেনতেনভাবে সার্টিফিকেটসর্বস্ব "শিক্ষিত" সাবালক তৈরি করতেই অধিকাংশ শিক্ষিত অভিভাবক আগ্রহী।

সুষ্ঠু নীতিমালার কারণে সব ক্ষেত্রেই একটা অবস্থা বিরাজ করছে। যে কারণে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়ার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১ জন শিক্ষিকাসহ ভিড়ের চাপে পদদলিত হয়ে মারা গিয়েছে ৬ জন। নৈতিক মূল্যবোধ, অব্যবস্থাপনার কারণে এ জাতীয় দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

এধরনের বিচ্ছৃংখল পরিস্থিতি অনেক দিন থেকেই শুরু হয়ে বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই মহীরুহ নকলের মহোৎসবকে উচ্ছেদ করতে গণসচেতনতা, নৈতিক মূল্যবোধ প্রয়োজন। গণসচেতনতা থেকেই পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানো, নীতিমালা পরিবর্তন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ভাবতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবে।